১১.২ হিন্দুধর্ম (Hinduism)

জগতের প্রচলিত ধর্মগুলির মধ্যে হিন্দুধর্ম প্রাচীনতম এবং বৈচিত্র্যের দিক থেকে প্রধানতম। তিন হাজার বছরের পুরনো এই ধর্ম অসংখ্য ধর্ম সম্প্রদায় ও দার্শনিক

Scanned by CamScanner

তত্ত্বের জন্ম দিয়েছে। যুগ যুগ ধরে অসংখ্য মুনি-ঋষি, আচার্য-ভক্তের দার্শনিক বিচার ও নৈতিক উপদেশ ও প্রজ্ঞার দ্বারা ঋদ্ধ এই ধর্মে প্রাচীন ও আধুনিক কালের চিন্তার অভূতপূর্ব সমন্বয় ঘটেছে। সুদূর প্রাচীনকালে উদ্ভূত হয়েও আজও অসংখ্য মানুষের জীবনে এই ধর্মের প্রভাব অক্ষুণ্ণ রয়েছে।

হিন্দুধর্মের প্রধান উৎসগুলি হল ঃ (১) শ্রুতি বা চতুর্বেদ, (২) মনু, যাজ্ঞবল্ক্য, পরাশর প্রমুখের ধর্মশাস্ত্র বা স্মৃতিশাস্ত্র, (৩) পুরাণ ও উপপুরাণ সমূহ, (৪) রামায়ণ, মহাভারত এবং গীতা, (৫) দুটি বেদাঙ্গ তার মধ্যে স্রৌত্র, গৃহ্য ধর্মসূত্র প্রধান, (৬) ছটি দর্শন বা ষড়দর্শন ঃ ন্যায়, বৈশেষিক, সাংখ্য, যোগ, মীমাংসা, বেদান্ত এবং তাদের অসংখ্য সূত্র, টীকা, ভাষ্য।*

হিন্দুধর্মের ভিত্তি এত বিচিত্র এবং তার পরিসর এত ব্যাপক যে অন্যান্য ধর্মের ছকে তাকে মেলানো যায় না। নিজস্ব কিছু বৈশিষ্ট্যের জন্য তা জগতের প্রচলিত বিশ্বধর্মগুলির মধ্যে অনন্য। হিন্দুধর্মের মর্মবাণীটি একটি বৈদিক মন্ত্রের দ্বারা প্রকাশ করা যায়। বেদের এই মন্ত্রটি গায়ত্রী মন্ত্র হিসাবে সুপরিচিত। মন্ত্রটি হল ওঁ, ভূর্ভবঃ স্বঃ তৎ সবিতুর্বরেণ্য, ভর্গো দেবস্যধীমহি, ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ।।

অর্থাৎ "ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, পৃথিবী, অন্তরীক্ষ, স্বর্গলোককে ক্ষেত্র করে যে সূর্য রয়েছে, তাঁকে জগৎশ্রেষ্ঠ দেবতা বলে মান্য করা হচ্ছে। ওই জগৎশ্রেষ্ঠ দেবতাই আমাকে বিভিন্ন কাজে উদ্বুদ্ধ করছেন।" জ্যোতিস্বরূপ পরমচৈতন্যময় সত্তার প্রতি ভক্ত হৃদয়ে.র এই প্রার্থনার মধ্যে হিন্দুধর্মের গভীর তত্ত্বটি নিহিত আছে।

হিন্দুধর্মকে বৈদিক ধর্মও বলা হয়। কারণ, ঋক, সাম, যজু ও অথর্ব—এই চতুর্বেদ হিন্দুধর্মের মূল ভিত্তি। বেদকেই হিন্দুরা প্রধান ও প্রামাণ্য ধর্মগ্রন্থ বলে স্বীকার করেন। তবে হিন্দুধর্মের বিবর্তনের সুদীর্ঘ পথে বিভিন্ন অবৈদিক চিন্তাধারা, আচার-অনুষ্ঠান, প্রথা এসে মিশেছে। হিন্দুদের পূজিত অনেক দেবদেবীর নাম বেদে উল্লেখ করা হয়নি। বেদের ঐতিহাসিক উৎপত্তি সম্বন্ধে গবেষকদের মধ্যে মতভেদ আছে। ঋগ্বেদই সবচেয়ে প্রাচীন।

Max Muller-এর মতে, ঋগ্বেদের আদি অংশ রচিত হয়েছিল খ্রিস্টপূর্ব দ্বাদশ থেকে ষষ্ঠ শতকের মধ্যে। পরবর্তীকালে মহামান্য তিলক ও Jacobi খ্রিস্টধর্মের সাড়ে চার থেকে আড়াই হাজার বছর আগে ঋগ্বেদের রচনাকাল বলে দাবি করেছেন।** বেদকে মনুষ্যসৃষ্ট সর্বপ্রাচীন সাহিত্যও বলা যায়।

Scanned by CamScanner

বেদের দুটি ভাগ মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ। মন্ত্রগুলিতে রয়েছে দেবতার মহিমা কীর্তন ও প্রার্থনা। এগুলি ছন্দে রচিত। ব্রাহ্মণগুলি গদ্যে রচিত, এতে যাগযজ্ঞ ইত্যাদির বর্ণনা আছে। এর কিছু অংশে দার্শনিক তত্ত্বালোচনাও আছে। এগুলিকে উপনিষদ বলা হয়। হিন্দুধর্ম ও ভারতীয় দর্শনে উপনিষদের স্থান অতি উচ্চে। হিন্দুদের সর্বাধিক পঠিত ও প্রচারিত গ্রন্থ গীতায় ধর্মশাস্ত্র ও উপনিষদের মর্মকথা প্রকাশিত হয়েছে।

হিন্দুধর্মের মূল তত্ত্ব হল, ঈশ্বর জগতের পরম সত্য। তবে এই জগৎ ছাড়াও তিনি অসংখ্য জগতে নিজেকে প্রকাশ করেন। তিনি সমগ্র বিশ্বে অন্তর্ব্যাপ্ত (immanent) হয়েও অতিবর্তী (transcendent)। তিনি পরম এক, আবার বিভিন্ন দেবদেবীর মধ্য দিয়েও তিনি নিজেকে প্রকাশ করেন। এই সকল দেবদেবীর যে কোন একজনকে উপাসনা করলেই সেই এক ও অদ্বিতীয় ঈশ্বরের উপাসনা হয়।

ধর্ম শব্দের উৎপত্তি 'ধৃ' ধাতু থেকে। ধর্ম হল তাই, যা বিশ্বজীবনকে ধারণ করে। ছান্দোগ্য উপনিষদে ধর্মের তিনটি শাখার কথা বলা হয়েছে—ছাত্রের ধর্ম, গৃহীর ধর্ম ও সন্ন্যাসীর ধর্ম। তৈত্তিরীয় উপনিষদে বলা হয়েছে জীবনের প্রত্যেকটি পর্যায়ের কর্তব্যসাধনই ধর্ম। হিন্দুধর্মের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল জীবনে জ্ঞান, কর্ম ও ভক্তির সমন্বয় সাধনের কথা বলা। হিন্দু ধর্ম যতটা ধর্ম, ততটাই দর্শন। তার সাধনা মুক্তির সাধনা। তার জন্য প্রয়োজন শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন। গুরু বাক্য শ্রদ্ধার সঙ্গে শ্রবণ করতে হবে। তারপর মননের দ্বারা অর্থাৎ নিজস্ব অভিজ্ঞতা ও বিচারবুদ্ধির দ্বারা তার পর্যালোচনা করতে হবে। এই পর্যন্ত হল তত্ত্বজ্ঞানের সীমা। এরপরে নবলব্ধ জ্ঞানের সত্যতাকে হৃদয়ে উপলব্ধি করা ও তদনুযায়ী চিন্তা, বাক্য ও কর্মসম্পাদনের সংকল্প গ্রহণ—এই হল নিদিধ্যাসন। এইখানে Aristotle-এর দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। Socrates বলতেন, 'কোন মানুষ সজ্ঞানে অন্যায় করে না। জ্ঞানী মাত্রই ধার্মিক (knowledge is virtue)। Aristotle-এর মতে, উচিত বা ন্যায় সম্পর্কে জ্ঞান থাকলেই হয় না, সৎ সংকল্প গ্রহণের পর তাকে নিত্য অভ্যাসের দ্বারা কর্মে পরিণত করতে হয়। গীতায় যেমন বলা হয়েছে,

জানামি ধর্মং ন চ মে প্রবৃত্তি
জানাম্যধর্মং ন চ মে নিবৃত্তি

আমি জানি ধর্ম কী। কিন্তু তা পালন করার প্রবৃত্তি বোধ করি না, আর অধর্ম কী তাও আমি জানি। তবু তা থেকে নিজেকে নিবৃত্ত করতে পারি না। এইজন্যই ব্যবহারিক জীবনে জ্ঞান ও কর্মের সমন্বয় সাধনের প্রয়োজন আছে। এরসঙ্গে ভক্তির যোগে এক অখণ্ড ঐক্যের কথা বলে হিন্দুধর্মে ধর্ম ও দর্শনের একাত্মতা সাধন সম্ভব হয়েছিল।

Scanned by CamScanner

হিন্দুধর্ম সাধারণভাবে ঈশ্বরবাদী।* কিন্তু এতে একেশ্বরবাদ, বহুদেববাদ, পৌত্তলিকতাবাদ, আবার উচ্চস্তরের দার্শনিক তত্ত্ব সমৃদ্ধ অদ্বৈতবাদের এক আশ্চর্য সহাবস্থান। আবার এরই পাশাপাশি স্থূল প্রাণবাদ, ইন্দ্রজাল, তন্ত্র-মন্ত্র, ঝাড়ফুঁক ইত্যাদিও সমান্তরাল ভাবে প্রবহমান। বিশাল এই ভারতীয় ভূখণ্ডের বিভিন্ন অঞ্চলের ভাষা, সংস্কৃতি, রীতিনীতি, আচার-আচরণের বিভিন্নতা, বৈদিক আর্যদের সঙ্গে আদিবাসীদের সংস্কৃতির সমন্বয় ইত্যাদি কারণে হিন্দুধর্ম এত বৈচিত্র্যপূর্ণ ও ব্যাপক আকার ধারণ করতে পেরেছে। এখন আমরা হিন্দুধর্মের মূল বিশ্বাসগুলি সম্পর্কে আলোচনা করব।

ক. কর্মবাদ (The Theory of Karma) ঃ হিন্দু ধর্মমতের মূল স্তম্ভ কর্মবাদ। একমাত্র চার্বাকপন্থীরা ছাড়া বৈদিক ও বেদ বিরোধী সমস্ত ভারতীয় তত্ত্বে কর্মবাদকে গ্রহণ করা হয়েছে। কর্মবাদের দুটি দিক। প্রথমটি হল কৃতপ্রণাশা বা সম্পাদিত কর্মের ফলের অবশ্যম্ভাবিতা। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের মূল ভিত্তি হল কার্যকারণ সম্বন্ধের নিশ্চয়তায় বিশ্বাস। এই বিশ্বাসের পরিচয় পাওয়া যায় কয়েক হাজার বছর পূর্বের ভারতীয় ধর্মতাত্ত্বিকদের ব্যাখ্যায়। আজকে আমাদের জীবনে যা কিছু ভালোমন্দ আমরা ভোগ করি তার কারণ নিহিত আছে আমাদের অতীত কর্মের মধ্যে।

কর্মবাদের দ্বিতীয় দিক হল এই বিশ্বাস যে আমাদের জীবনে যা কিছু ঘটে তার জন্য আমরাই দায়ী, অন্য কেউ নয়। নৈতিক জীবনের ক্ষেত্রে এই বিশ্বাসের গভীর তাৎপর্য রয়েছে। মানুষ অদৃষ্টের হাতের পুতুল নয়। কারণ মানুষ স্বয়ং অমৃতের পুত্র। সে নিজের ভাগ্যবিধাতা, বন্ধন বা মুক্তি সবকিছুর নিয়ন্তা সে নিজেই।

পাশ্চাত্যের ধর্মতত্ত্ববিদরা হিন্দু কর্মবাদের অনেক অপব্যাখ্যা করেছেন। বলা হয়েছে কর্মবাদ অদৃষ্টবাদ বা নিয়তিবাদকে প্রশ্রয় দেয়। ভারতীয়রা যে বৈষয়িক উন্নতিতে বা জ্ঞান-বিজ্ঞানের অগ্রগতিতে পিছিয়ে পড়েছিল তার মূলে আছে কর্মবাদ বা অদৃষ্টবাদের প্রভাব।

ভারতীয় দার্শনিকদের মতে এই ব্যাখ্যা গ্রহণযোগ্য নয়, কারণ, কর্মের দ্বারা বন্ধন হয় এই কথা বললেও কর্মের দ্বারাই মুক্তির কথাও কর্মবাদে বলা হয়েছে। সকাম কর্ম অর্থাৎ ফলের আশায় যে কর্ম করা হয় তার থেকেই পুনর্জন্ম ও দুঃখভোগের বন্ধনদশা চলতে থাকে। কিন্তু যদি বাসনামুক্ত চিত্তে স্বার্থশূন্য কর্ম করা যায় তাহলে মুক্তিলাভ করা যায়। এই মুক্তি দু'রকম—জীবন্মুক্তি ও বিদেহমুক্তি। হিংসা, দ্বেষ,

Scanned by CamScanner

লোভমূলক কর্মের বিনাশের দ্বারা মানুষ এই জন্মেই মুক্তির অমৃত স্বাদ পেতে পারে। জীবিত অবস্থায় এই বন্ধন মুক্তিই হল জীবন্মুক্তি, সুতরাং নিষ্কাম কর্মের অর্থ কর্মজীবন থেকে পলায়ন নয়। জীবনযুদ্ধে নিস্পৃহভাবে কর্ম সম্পাদন করা।

খ্রিস্টধর্মের তাত্ত্বিকরা দাবি করেন যে, তাঁদের ধর্মই শ্রেষ্ঠ। স্বয়ং ঈশ্বরের পুত্র যিশু ক্ষমা, প্রেম ও ত্যাগের প্রতিমূর্তি। মানুষের সমস্ত পাপের গ্লানি মাথায় নিয়ে তিনি মৃত্যুবরণ করেন এবং ঈশ্বরের কাছে তার ঘাতকদের জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করেন। সুতরাং যিশুর প্রেমের দৃষ্টান্ত নজিরবিহীন।

হিন্দুধর্মেও ঈশ্বরকে প্রেমময় ও করুণাময় বলা হয়েছে। কিন্তু মানুষকে তার কর্মের ফলাফলের দায়িত্ব অর্পণ করে তার অন্তর্নিহিত নৈতিক শক্তি ও স্বাধীনতাকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। ঈশ্বর ক্ষমাশীল হলেও নৈতিক শৈথিল্যকে ক্ষমা করেন না। কারণ তিনি নৈতিক আদর্শের রক্ষাকর্তা। খ্রিস্টধর্মে যেমন ঈশ্বরের প্রেম ও ক্ষমাশীলতাকে তেমনি ইসলাম ধর্মে তাঁর ন্যায়পরায়ণতা ও সার্বভৌমতাকে সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। হিন্দুধর্মে এই দুইয়ের সমন্বয় সাধন করে মানুষের মর্যাদা ও নৈতিক স্বাধীনতার আস্থা স্থাপন করা হয়েছে।

খ. ঈশ্বরবাদ (Theism) ঃ হিন্দুমতে ঈশ্বর জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের অধিকারী। ঈশ্বর জগতের সৃষ্টির উপাদান ও নিমিত্ত কারণ, ব্রহ্মা ও প্রজাপতিরূপে তিনি সৃষ্টিকর্তা, বিষ্ণুরূপে রক্ষাকর্তা ও রুদ্ররূপে সংহার কর্তা। এই পরম পুরুষের এই তিন প্রকাশকে লোকপুরাণে তিনজন দেবতা রূপে বর্ণনা করা হয়েছে। যে শক্তির সাহায্যে ঈশ্বর সৃষ্টি, স্থিতি, লয় সাধন করেন তাই হল মায়া, একে ত্রিগুণাত্মিকা শক্তিও বলা হয়। ঈশ্বর জগতে পরিব্যাপ্ত (immanent) হয়েও জগৎ-অতিবর্তী (Transcendent)। সর্বশক্তিমান ঈশ্বর অনন্ত প্রেম, অপার করুণা ও অসীম ক্ষমতার আধার। গীতা ও শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে তাঁকে আমাদের মনের অন্তর্যামী বলা হয়েছে। উপনিষদে মানুষকে বলা হয়েছে অমৃতের সন্তান। মানবস্বরূপের অনন্ত সম্ভাবনাকে স্বীকার করে বলা হয়েছে যে মানুষের স্বাধীনতা থাকলেও ঈশ্বর স্নেহময় পিতার মতো, প্রত্যেক জীবকে তাদের নিজ নিজ ক্ষমতা অনুযায়ী কর্মসাধনে ও ফলভোগে পরিচালন করেন। কর্মফলদাতা হিসাবে ঈশ্বর নৈতিক আদর্শের রক্ষাকর্তা।

ঋগ্বেদে বিভিন্ন প্রাকৃতিক শক্তিকে দেবদেবী হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে, যেমন বজ্রের দেবতা ইন্দ্র, জলের দেবতা বরুণ ইত্যাদি। লক্ষ্য করা যায় যে, যখন যে দেবতার প্রার্থনা করা হয় তাকেই শ্রেষ্ঠ বলা হয়। Max Muller এই প্রথাকে

Scanned by CamScanner

একদেবপ্রাধান্যবাদ (Henotheism) বলে উল্লেখ করেছেন। আবার বৈদিক যুগের পর পৌরাণিক যুগে বহু দেবদেবীর উল্লেখ থাকলেও ইন্দ্রকে বলা হয়েছে দেবরাজ। কখনও অন্যান্য দেবতার তুলনায় ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরকে ঊর্ধ্ব স্থান দেওয়া হয়েছে। আবার কখনও বিষ্ণু বা মহাদেবকে দেবাদিদেব বলা হয়েছে। অর্থাৎ বৈদিক যুগ থেকেই হিন্দুধর্মের একেশ্বরবাদী চিন্তার একটি ধারা লক্ষ্য করা যায়।

গ. আত্মার পুনর্জন্মবাদ (The Theory of Transmigration of Soul) : কর্মবাদ ও আত্মার অমরত্ব ও পুনর্জন্মে বিশ্বাস অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত। এই জন্মের সকাম কর্মের ফলভোগের জন্য মানুষকে পুনরায় জন্মগ্রহণ করতে হয়। দেহ ও আত্মা এক নয় দেহ মৃত্যুর দ্বারা বিনষ্ট হয়, কিন্তু আত্মা অবিনাশী কিন্তু সাধারণ মানুষ অজ্ঞতা হেতু দেহ ও আত্মাকে অভিন্ন মনে করে। ভ্রান্ত জ্ঞান থেকে কাম-ক্রোধ-বাসনাযুক্ত কর্ম সম্পাদন ও তার ফলভোগজনিত বন্ধনদশা শুরু হয়। প্রকৃত জ্ঞানের দ্বারা মনের ভ্রান্তি দূর করা ও যোগাভ্যাসের দ্বারা (যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়ম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি) চিত্তকে আসক্তিশূন্য করে নিষ্কাম কর্ম করলে এই পুনঃজন্ম জন্মের দশা থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব। ঋগ্বেদ, ছান্দোগ্য, বৃহদারণ্যক, শ্বেতাশ্বতর ইত্যাদি উপনিষদে বলা হয়েছে জীবাত্মাই পরমাত্মা, জীবাত্মা ও পরমাত্মার ভেদ জ্ঞান দূর হওয়া মাত্রই আত্মা উপলব্ধি করে 'অহং ব্রহ্মাস্মি'। এই ব্রহ্মতত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা আত্মা মুক্তি ও অমরত্ব লাভ করে। প্রাচীন গ্রিকরাও জন্মান্তরে বিশ্বাসী ছিল। হিন্দুধর্মে আত্মার উৎপত্তি নেই, বিনাশও নেই। আত্মা নিত্য অবিনশ্বর।

কর্মবাদ ও জন্মান্তরবাদের মূলে আছে সার্বিক কারণতায় বিশ্বাস। বিশ্বের সবকিছুই অমোঘ নিয়মে বাঁধা, ঋগ্বেদে একেই বলা হয়েছে 'ঋত'। 'ঋত' শুধু বাহ্য বস্তুজগৎকেই নিয়ন্ত্রিত করে না, তা মানুষের নৈতিক জীবনেরও নিয়ামক বলে বিশ্বাস করা হত। পরবর্তী যুগে ধর্ম বলতে সবকিছুর ধারক ও আশ্রয় অর্থে এজাতীয় নিয়মকেই বোঝানো হত। অর্থাৎ অতি প্রাচীনকাল থেকেই হিন্দুধর্মে নৈতিক আদর্শকে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে।

জন্মান্তরের ধারণায় জগতের সমস্ত জীবনের মধ্যে অচ্ছেদ্য ধারাবাহিকতা ও সার্বিক কারণতার দ্বারা উদ্ভিদ থেকে মানুষ এমনকি দেবতা পর্যন্ত সকলের জীবন ও কর্মকে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। পুনর্জন্মবাদের মর্মকথা হল, মানুষ জন্মের জন্য প্রয়োজন অসংখ্য পূর্বজন্মের সুকৃতি। আবার মানুষ জন্মের কৃতকর্মের জন্য ভবিষ্যতে যেকোন অনুন্নত স্তরের জীবনে অবনমন ঘটাতে পারে।

Scanned by CamScanner

ঘ. হিন্দুবর্ণাশ্রমবাদ (Hindu Varnasrama Dharma) ঃ হিন্দুধর্মে চতুরাশ্রম ও চতুর্বর্ণের দ্বারা যথাক্রমে ব্যক্তিজীবন ও সমাজের বিভাজনের কথা বলা হয়েছে। চতুরাশ্রম হল ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস। আদর্শ মানবজীবনের প্রথম পর্বে গুরুগৃহে অধ্যয়ন ও জ্ঞান অর্জন, দ্বিতীয় পর্বে গৃহীজীবনে ভোগসুখের স্পৃহা চরিতার্থ করা, তৃতীয় পর্বে সংসার নিরাসক্ত জীবনযাপন ও চতুর্থ পর্বে সংসার ত্যাগ করে মুক্তিলাভের সাধনা—এই চতুরাশ্রমের পরিকল্পনা করা হয়েছে। ব্যক্তি জীবনের এই চারটি পর্বের সঙ্গে চারটি পুরুষার্থও নির্দিষ্ট করা হয়েছে। যথা, কাম, অর্থ, ধর্ম ও মোক্ষ। প্রথম দুটি হল প্রবৃত্তি মার্গের এবং দ্বিতীয় দুটি নিবৃত্তি মার্গের। এইভাবে ব্যক্তি জীবনে ভোগ ও ত্যাগের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখার সুচিন্তিত পরিকল্পনা রয়েছে। সুতরাং হিন্দুধর্ম কেবল বৈষয়িক নিরাসক্তি ও আধ্যাত্মিক মুক্তির কথা বলে বাস্তব জীবনকে অস্বীকার করে—এধরনের আলোচনা যথার্থ নয়।

ভারতীয় সমাজজীবনের চারটি বর্ণ বিভাজনের মধ্যেই ছিল শ্রম বিভাজনের মাধ্যমে সামাজিক কর্মের দক্ষতা বৃদ্ধির চিন্তা (Division of labour and specialisation)। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র হিসাবে সমাজের এই শ্রেণিবিভাগের কারণ ছিল মানুষের শিক্ষাদীক্ষা, শক্তিসামর্থ্য অনুযায়ী সামাজিক প্রয়োজন ও কর্মকে সুবিন্যস্ত করা। পরবর্তীকালে নানা ঐতিহাসিক কারণে হিন্দুধর্ম অনুষ্ঠানসর্বস্ব যান্ত্রিক আচারে পরিণত হয়। শ্রেণি বিভাজনের মূল কারণটি লুপ্ত হয়ে জাতিভেদ ও অস্পৃশ্যতার বিচার সমাজকে গ্রাস করে। প্রত্যেক ধর্মকেই নানা উত্থান-পতনের মধ্যে দিয়ে এগিয়ে যেতে হয়। হিন্দুধর্মের মতো এত প্রাচীন ও ব্যাপক ধর্মকেও নানা কুসংস্কার ও প্রতিবন্ধকতার মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছে এবং হচ্ছে।

ঙ. অবতারবাদ (Doctrine of Incarnation) ঃ হিন্দুধর্ম অবতারবাদে বিশ্বাসী। 'অবতার' শব্দের আক্ষরিক অর্থ অবতীর্ণ হওয়া। কাল বিশেষে জগদ্বিধাতা বিশিষ্ট পুরুষ রূপে ধরাধামে অবতীর্ণ হন। সেই বিশিষ্ট পুরুষকেই বিধাতার অবতার বলা হয়। হিন্দুদের বিশ্বাস, যখনই পৃথিবীতে অধর্ম, পাপ, গ্লানি, অবিচার বৃদ্ধি পায় তখন পরম করুণাময় জগতের নৈতিক আদর্শের নিয়ামক ঈশ্বর জীবের কল্যাণের জন্য ধরায় অবতীর্ণ হন ও পাপের বিনাশ ও ন্যায়ের রাজত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেন। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলেছেন—

যদা যদা হিধর্মস্য গ্লানির্ভবতিভারত
অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম।। (৪/৭)
পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্
ধর্ম সংস্থাপনর্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে।। (৪/৮)

Scanned by CamScanner

ঈশ্বরের ধরায় অবতার রূপে আবির্ভাবের জন্য উপযুক্ত আধারের প্রয়োজন হয়। যে কোন জীব বা মানুষ অবতার হতে পারে না। যুগের প্রয়োজনে অবতারের ব্যক্তিত্ব ভিন্ন হয়। কখনও যুদ্ধে অস্ত্রধারণ করে অন্যায়কারীকে নিধন করে ন্যায়ের পক্ষে যিনি যুদ্ধে তাকে সাহায্য করেন, কখনও অহিংসা ধর্ম প্রচার করে নৈতিক অধোগতিকে রোধ করেন। রামায়ণ-মহাভারতের যুগে বিষ্ণুই সর্বপ্রধান দেবতা হিসাবে গণ্য হতেন। খ্রিস্টধর্মও অবতারবাদে বিশ্বাসী, তবে হিন্দুধর্মের অবতারতত্ত্বের সঙ্গে তার কিছু পার্থক্য আছে। যিশুখ্রিস্ট অবতার হলেও তিনি যতটা ঈশ্বর ততটাই মানুষ। তিনি ঈশ্বরের সন্তান এবং একজন শ্রেষ্ঠ মানুষ। তিনি মানুষকে পাপের হাত থেকে বলিদানের জন্য আত্মবলিদান করেন। হিন্দু অবতারতত্ত্বে জগতের অধর্ম, পাপ ও অনাচার যখন সীমা লঙ্ঘন করে তখন জগতে ধর্মের প্রতিষ্ঠার জন্য স্বয়ং ঈশ্বরই জগতে আবির্ভূত হন।

দ্বিতীয়ত, খ্রিস্টধর্মে ঈশ্বরের একটিই অবতারের উল্লেখ পাওয়া যায়। কয়েকজন ইহুদি ধর্মগুরুর কথা স্বীকার করলেও যিশুই ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠ অবতার বলে স্বীকৃত। হিন্দুধর্মে আমরা দশ অবতারের উল্লেখ পাই। কোন কোন মতে অবতারের সংখ্যা চব্বিশ বা আরও বেশি। প্রকৃতপক্ষে যখনই কোন মানুষ এমনকি জীবের মধ্যে দুর্লভ কোন গুণ বা শক্তির প্রকাশ ঘটেছে তখন তাকে হিন্দুরা অবতার হিসাবে গ্রহণ করেছেন। খ্রিস্টীয় মতে, ঈশ্বর কেবল নবরূপেই আবির্ভূত হয়েছেন। এমনকি পরম করুণাময় বুদ্ধ, প্রেমময় শ্রীচৈতন্য এবং আধুনিক যুগে শ্রীরামকৃষ্ণ অবতার হিসাবে পূজিত হন। অবতারবাদের মূল কথা হল প্রত্যেক দেশে, প্রত্যেক যুগে এমন কিছু মানুষ জন্মগ্রহণ করেন যাঁদের মধ্যে বিস্ময়কর আধ্যাত্মিক শক্তি ও মানবিক গুণের প্রকাশ ঘটে এবং তাদের মধ্যে দিয়ে ঈশ্বরের ইচ্ছা, ঈশ্বরের বাণী জগতের মানুষের কাছে পৌঁছায়।

আধুনিক হিন্দুধর্ম বহু শাখায় বিভক্ত—শৈব, শাক্ত ও বৈষ্ণব। এই এক একটি শাখার আবার প্রশাখা আছে। এদের আচার-অনুষ্ঠানের মধ্যে অনেক পার্থক্যও আছে। তাসত্ত্বেও এইসব শাখা-প্রশাখার মূলকেন্দ্রে রয়েছে বৈদিক কিছু ধ্যানধারণা। তার জন্যই এদের সকলকে হিন্দুধর্মের শাখা হিসেবে গণ্য করা হয়।

বৈদিক হিন্দুধর্মের ওপর যুগে যুগে নানা দেশি-বিদেশি প্রভাব এসে পড়েছে। হিন্দুধর্ম তাদের গ্রহণ করে ব্যাপকতর ও উদারতর হয়েছে। উদারতা ও পরমত সহিষ্ণুতার ব্যাপারে হিন্দুধর্মের সঙ্গে অন্য কোন ধর্মের তুলনা চলে না। হিন্দুধর্ম কেবল ধর্ম নয়, তা এক জীবনদর্শন। এই দর্শনই উচ্চারিত হয়েছিল বৈদিক ঋষির সানন্দ ঘোষণায়—

Scanned by CamScanner

'শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রা
আ যে ধামানি দিব্যানি তস্থূ।'*২/৫
'বেদাহমেতং পুরুষং মহন্তম্
আদিত্যবর্ণং তমসো পরস্তাৎ।
ত্বমেব বিদিত্বাহতি মৃত্যু মেতি
ন্যান্যং পন্থা বিদ্যতে হয়নায়'।।**৩/৮

শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ—দ্বিতীয় অধ্যায় পঞ্চম ও তৃতীয় অধ্যায় অষ্টম শ্লোক

—শোন হে বিশ্বের অমৃতের পুত্রগণ, শোন দিব্যলোকের অদিবাসীগণ, সেই শাশ্বত মহান পুরুষকে জেনেছি, আদিত্যের ন্যায় তাঁর বর্ণ, তিনি সকল অজ্ঞান ও অন্ধকারের পারে, তাঁকে জানলেই মৃত্যুকে অতিক্রম করা যায়, পরম পদলাভের অন্য কোন পথ নেই।

হিন্দুধর্ম মানুষকে পাপী বলে না। তারা সবাই ঈশ্বরের সন্তান, অমৃতের অধিকারী, তাদের মধ্যে যে দেবত্ব রয়েছে ধর্মের দ্বারা তারই বিকাশ ঘটে।

Scanned by CamScanner